মাস্টারমশায়ের রামকৃষ্ণ-যাপন

স্বামী শিবপ্রদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন স্বামী যোগানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, ''হ্যাঁরে, আমাকে কী বোধ হয়?'' উত্তরে স্বামী যোগানন্দ বলেছিলেন, ''না গৃহস্থ, না সন্ন্যাসী।'' উত্তর শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন, ''তুই এত বড় কথাটা বললি।'' বস্তুতপক্ষে স্বামী যোগানন্দ অনুভব করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি গৃহী ও সন্ন্যাসীর পরপারে। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয় অবস্থা তথা আশ্রমের মর্যাদা রক্ষা করেছেন এবং তিনি তাঁর জীবনের নিরিখে মানুষকে দেখিয়েছেন যে তিনি উভয়েরই আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখের মাধ্যমে যেমন আদর্শ সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তেমনি বলরাম বসু, মাস্টারমশাই, নাগমহাশয় প্রমুখের মাধ্যমে আদর্শ গৃহীর জীবন যাপনেরও পথ দেখিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল গৃহস্থদের জন্য অথবা শুধুমাত্র সন্ন্যাসীদের জন্য পৃথিবীতে আসেননি। পরন্তু একথা বলা চলে, যাঁরা মনে প্রাণে ভগবানকে চান তিনি তাঁদের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গৃহকে আশ্রমে পরিণত করা যে সম্ভব তার প্রমাণ বলরাম বসুর বাগবাজারের বাড়ি। আজ সেই বাড়ি সমগ্র পৃথিবীতে 'বলরাম মন্দির' নামে স্বীকৃত। অনুরূপভাবে মাস্টারমশাই তথা 'শ্রীম' তাঁর ভাগবত জীবনের আঙ্গিকে অনাগতকালের শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগিবৃন্দের কাছে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। মাস্টারমশায়ের আবাসস্থল আজ 'কথামৃত ভবন' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

শ্রীম অন্যান্য অবতারের সঙ্গেও তাঁদের লিপিকাররূপে যে এসেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তা জানতেন এবং এ-বিষয়ে ইঙ্গিতও করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ''তোমায় চিনেছি তোমার চৈতন্যভাগবত পড়া শুনে। তুমি আপনার জন, এক সত্তা—যেমন পিতা আর পুত্র।'' শ্রীম একবার সংসারত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, ''ভাগবত পণ্ডিতকে একটি পাশ দিয়ে ঈশ্বর রেখে দেন, তা না হলে ভাগবত কে শুনাবে? রেখে দেন লোকশিক্ষার জন্য। মা সেইজন্য সংসারে রেখেছেন।''

শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হওয়ার পর প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর শ্রীম প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বিতরণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সুধা পানের আশায় কত মানুষ তাঁর কাছে ছুটে গেছেন। নিরলসভাবে শ্রীম সকাল

থেকে রাত পর্যন্ত তৃষিত মানুষকে এমনভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা শুনিয়েছেন যা তাঁদের সংসার-জ্বালা জুড়িয়ে, মায়া, মোহ ও ক্লান্তি দূর করে, প্রাণে শক্তি, আশা ও আনন্দ সঞ্চার করেছে।

ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল মানুষ জগতে বেশি নেই। ব্যাকুলতা ঈশ্বরদর্শনের পূর্বলক্ষণ। শ্রীম-র জ্বলন্ত জীবন পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়েছে কীভাবে সদা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতাকে জাগ্রত রাখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন গৃহী ভক্ত নিয়মিতভাবে শ্রীম-র সংস্পর্শ লাভের জন্য তাঁর গৃহে মিলিত হতেন। ছোট নরেন, পূর্ণচন্দ্র, তেজচন্দ্র, অক্ষয়, দমদম মাস্টার (যজ্ঞেশ্বর) ও হরিপদ তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করে আনন্দ লাভ করতেন। চেন্নাই, মুম্বাই, কুমায়ুন, আসামসহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে এবং আমেরিকা, ইংল্যান্ড থেকে যেসব ব্যক্তি তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-ঐশ্বর্য তিনি অকাতরে বিলিয়েছেন কারণ তিনি ছিলেন সেই বাণীরত্নভাণ্ডারের মালিক। তাঁর গৃহ হয়ে উঠেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-রত্নভূমি তথা তীর্থভূমি। মাস্টারমশায়ের দেহমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্ত উপস্থিতি মানুষকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করত। শ্রীম ছিলেন অহংশূন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম-র দেহ-মন-প্রাণ এমন অধিকার করে বসেছিলেন যে তিনি নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিলেন।

গঙ্গা যখন পৃথিবীর ভূখণ্ডকে প্রথম স্পর্শ করছিল তখন তার দুর্বার গতিকে ধারণ করার ক্ষমতা পৃথিবীর ছিল না। পৃথিবী সরাসরি সেই ধারা ধারণের চেষ্টা করলে প্লাবন অনিবার্য ছিল। পুরাণ-গাথাসূত্রে আমরা জেনেছি, স্বয়ং মহাদেবকে জটাজাল বিস্তার করে দাঁড়িয়ে সেই ধারাকে জটাজালে ধারণ করতে হয়েছিল। পরে ধীরে ধীরে সেই জটাজাল থেকে মুক্ত হয়ে গঙ্গা ভূতল স্পর্শ করে। সেইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্যাণপ্রদ প্রবল অমৃতবাণীধারা শ্রীম প্রাথমিকভাবে সংগ্রহ করেন, সংরক্ষণ করেন এবং পরিশেষে সমকাল ও আগামীদিনের মানুষের জন্য সপ্রেমে তা পরিবেশন করেন। গঙ্গাবারি যেমন তার পাবনী শক্তি সহযোগে মানবসমাজের কলুষতা হরণ করে তেমনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত মানুষকে আসক্তিশূন্য জীবন যাপনের পরামর্শ দানে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থের প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত গ্রন্থে কখনও নিজের নাম প্রকাশ করেননি। নানা ছদ্মনামের অন্তরালে তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন। জীবনে তিনি এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে অসফল হয়েছিলেন। নিজেকে সম্পূর্ণ মুছে দেওয়ার নিরলস ও অবিরত চেষ্টা তাঁকে চিরপ্রতিষ্ঠা দান করেছে। যতদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পৃথিবীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হবে ততদিন মাস্টারমশায়ের নাম সমমর্যাদায় উচ্চারিত হবে।

শ্রীম-র বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ আছে। সেই অভিযোগ থেকে তিনি আজও মুক্তি লাভ করেননি, অনাগতকালেও সেই অভিযোগ তাঁকে পরিত্যাগ করে যাবে না। তিনি তাঁর সমকালের কলকাতায় 'ছেলেধরা মাস্টার' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর বিদ্যালয়ের ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রবৃন্দ সেই অনন্য গ্রন্থ পাঠ করে, তাঁর পবিত্র ও সস্নেহ আকর্ষণে তাঁর গৃহে সমবেত হতেন। পরবর্তী কালে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। আজও তার বিরাম নেই। ভাবী কালের তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের অন্তরে বৈরাগ্য-অগ্নি প্রজ্বলিত করতেও সেই গ্রন্থের জুড়ি মেলা ভার।

ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে কীভাবে সংসারে থাকতে হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অমৃতবাণীর মাধ্যমে রেখে গেছেন। সেই অমৃতোপম বাণীর অন্যতম ধারক ও বাহক শ্রীম। শ্রীরামকৃষ্ণ-অমৃতবাণীর আশ্চর্য আধার শ্রীম।

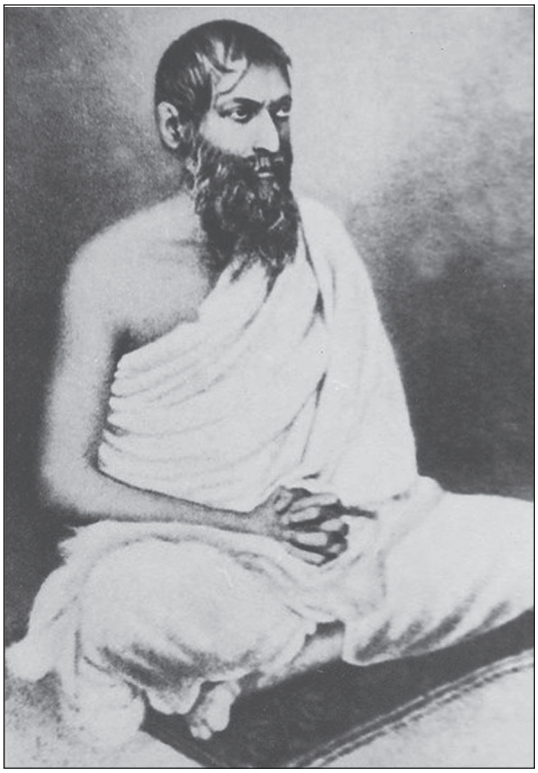

অমৃতময় বাণীকে ধারণ ও বিতরণ করতে হলে পাত্রকে উপযুক্ত হতে হয়। শ্রীম-র জীবনসাধনা তাঁকে সেই উচ্চতায় উত্তীর্ণ করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত পথ অনুসরণ, শ্রীমা সারদার অমোঘ আশীর্বাদ এবং স্বামী বিবেকানন্দসহ গুরুভ্রাতাদের আন্তরিক শুভেচ্ছাকে সম্বল করে শ্রীম-র জীবন রামকৃষ্ণময় হয়ে উঠেছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী পালনে তথা সাধনে সদাসচেষ্ট ছিলেন। মানবসমাজকে চিরচঞ্চল সংসারসমুদ্র থেকে তটভূমির ধ্রুবলোকে অগ্রসর হতে প্রাণিত করেছেন শ্রীম।

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ নরদেহে আবির্ভূত হয়েছেন, বলরাম মন্দির ও বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে সঙ্ঘশরীরে প্রকাশিত হয়েছেন এবং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, কথামৃত ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীশরীর ধারণ করেছেন। কথামৃত ভবনে বাণীরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের পূজারি শ্রীম। ভক্তি, ধ্যান ও আত্মনিবেদন সেই পূজার উপচার। আর সেই পূজার প্রসাদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

কলকাতায় মাস্টারমশায়ের প্রিয় স্থানগুলির মধ্যে রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম) ছিল অন্যতম। আদি গঙ্গার পাড়ে অবস্থিত গদাধর আশ্রম মহাতীর্থ কালীঘাট থেকে বেশি দূরে নয়। তিনি কথামৃত রচনার জন্য স্বামী কমলেশ্বরানন্দের আগ্রহে একটানা পাঁচ-ছয় মাস গদাধর আশ্রমে অতিবাহিত করেছেন। তাই শ্রীম-র গভীর ধ্যানের সূত্রে গদাধর আশ্রমে উন্মোচিত হয়েছেন বাণীরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণভাবে বিভোর শ্রীম-র সেই ভাবজীবন যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা ধন্য। শুধু রচনার ক্ষেত্রেই নয়, যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ করতেন তখন মনে হত যেন এক চিরবিরহী আত্মা যাতনায় ছটফট করছে। যেন অরূপসাগরের এক অপরূপ ঢেউ কিছুসময় হেলে দুলে আবার সেই অরূপসাগরে মিশে যেতে ব্যস্ত। ব্যাকুলতাভরা কণ্ঠে, উদাসী মনে প্রিয়তমের সন্ধানে সদাজাগ্রত জীবন যাপন করেছেন শ্রীম। গদাধর আশ্রম সেইসব দুর্লভ ঘটনার নীরব সাক্ষী।

শ্রীম ভারতের নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছেন। পুরী, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, হরিদ্বার ও অযোধ্যায় গমন করেছেন। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ অবস্থায় থাকার সময় মাস্টারমশাই প্রথম কামারপুকুর যাত্রা করেন। সেইসময় জয়রামবাটী, শিহড়, শ্যামবাজার প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর তিনি দক্ষিণেশ্বর ও বরানগর রামকৃষ্ণ মঠে নির্জনবাস ও তপস্যার জন্য চলে যেতেন। পিছনে পড়ে থাকত তাঁর সংসার। পরবর্তী কালেও শ্রীম আট-নয় বার কামারপুকুর গিয়েছেন। কামারপুকুর যাত্রায় তাঁকে অনেক ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে। গরুর গাড়ি থাকা সত্ত্বেও

বর্ধমান হয়ে অধিকাংশ রাস্তা তিনি পায়ে হেঁটে গিয়েছেন। তার উপর ছিল ডাকাতের ভয়। এসব অগ্রাহ্য করে কামারপুকুর পরিক্রমাশেষে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ফিরে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণকে সেই সংবাদ নিবেদন করলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, ''কি করে গেলে ও-ডাকাতের দেশে? আমি ভাল হলে একসঙ্গে যাব।'' একবার শ্রীম সংকল্প করেছিলেন যে তিনি কামারপুকুরেই অবস্থান করবেন। সেখানে থাকার সব তোড়জোড় হতে লাগল। তখন তাঁর মনে হল শ্রীমায়ের সম্মতি নেওয়া প্রয়োজন। শ্রীম শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করায় মা হেসে বলেছিলেন, ''বাবা, ও-জায়গা ম্যালেরিয়ার ডিপো—ওখানে থাকতে পারবে না। পাড়াগাঁ ম্যালেরিয়ার জায়গা, কী করে থাকবে।'' ফলত মাস্টারমশাই পাকাপাকি- ভাবে কামারপুকুর বাসের ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

শ্রীম-র দিনলিপি লেখার অভ্যাস ছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট পর্যন্ত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পূতসঙ্গ লাভ করেছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণবাণীসহ অনুপুঙ্খ বিবরণ সূত্রাকারে লিখে রেখেছিলেন। ২৩ এপ্রিল ১৮৮৬ সন্ধ্যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করেন, ''ওহে তুমি ঠাকুরের বিষয়—কি নাকি লিখেছো?'' শ্রীম উত্তরে বলেন, ''কে বললে?'' গিরিশচন্দ্র অনুরোধের সুরে বলেন, ''আমি শুনেছি। আমায় দেবে?'' শ্রীম বলেন, ''না; আমি নিজে না বুঝে কারুকে দেব না—ও আমি নিজের জন্য লিখেছি। অন্যের জন্য নয়!... আমার দেহ যাবার সময় পাবে।'' ক্রমে মাস্টারমশায়ের উপর যখন তা প্রকাশের অনুরোধ বর্ধিত হতে থাকল তখন তিনি শ্রীমায়ের আদেশে ওইসমস্ত দিনলিপি থেকে স্থানে স্থানে শ্রীমাকে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। শ্রীমা তা শুনে এতই সন্তুষ্ট হন যে মাস্টারমশাইকে আশীর্বাদ করে তা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেন। তখন 'The Gospel of Sri Ramakrishna' প্রথম খণ্ড ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সেই গ্রন্থ পাঠ করে স্বামী বিবেকানন্দ ১২ অক্টোবর ১৮৯৭ তারিখের একটি চিঠিতে শ্রীমকে লিখেছিলেন, "Now you are doing just the thing, Come out man! Bravo, that is the way. Many many thanks for your publication." উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ হলে স্বামীজী শ্রীমকে ২৪ নভেম্বর ১৮৯৭ তারিখের একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "It is indeed wonderful. The move is quite original and never was the life of a great teacher brought before the public untarnished by the writer's mind as you are presenting this one." তার কারণ নির্দেশ করে তিনি লিখেছিলেন, "...Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely hidden."

শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক ত্যাগ, বালকসুলভ সরলতা, অতুলনীয় ঈশ্বরপ্রেম, অদ্ভুত নিরভিমানিতা, অপূর্ব জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, অনন্য কণ্ঠস্বর এবং মুহুর্মুহু সমাধিলাভ মাস্টারমশায়ের হৃদয়কে উদ্বেল করে তুলত। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ দর্শনের জন্য শ্রীম ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। এত আকর্ষণ যে শরীরের কথা বিস্মৃত হয়ে যেতেন। বৈশাখ মাস, প্রচণ্ড রোদ্দুর, যানবাহন নেই, তবুও পায়ে হেঁটে শ্যামবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়েছেন। কে যেন তাঁকে টেনে নিয়ে যেত। ঘর্মাক্ত-কলেবর মহেন্দ্রনাথকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ''তাই ভাবি, আমার এ-সব বাই নয়! তা না হলে ইংলিশম্যানরা এত কষ্ট করে আসে!'' আর একবার শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বলেছিলেন, ''তোমার এখানকার প্রতি এত টান কেন? কলকাতায় অসংখ্য লোকের বাস, তাদের কারও প্রীতি হল না, তোমার হল কেন? এর কারণ জন্মান্তরের সংস্কার।''

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে উচ্চাধিকারী সংস্কারবান পুরুষ জেনে যথাবিধি সাধনপ্রণালী শিখিয়েছিলেন। কীভাবে সাকারে মন স্থির করতে হয় এবং কীভাবে নিরাকারের উপাসনা করতে হয়, কীভাবে দাসীর মতো সংসারে থেকে ঈশ্বরে মনপ্রাণ অর্পণ করা যায়, কীভাবে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে হয় তা দৃষ্টান্ত সহকারে মহেন্দ্রনাথকে হৃদয়ঙ্গম করিয়েছিলেন। সময়ে সময়ে পক্ষাধিক বা মাসাধিক কাল তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে বাস করে অহর্নিশি ঈশ্বরচিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকতেন। শ্রীম অনুভব করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা করে না বুঝিয়ে দিলে কেউ তাঁকে বুঝতে পারবে না। ধর্মস্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্পর্কে মাস্টারমশায়ের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি ভক্তদের বলেছিলেন, ''ঠাকুরকে দেখেই রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্যদেব ও ক্রাইস্ট প্রমুখ যে অবতার তাতে আর সন্দেহ রইল না।''

শ্রীম বলতেন, ''গুরুর কৃপা আছে। সংসারে চৈতন্য হবার জন্যই দুঃখ কষ্ট দিচ্ছেন।'' তাঁর জিহ্বা ভগবৎপ্রসঙ্গে, তাঁর হস্তদ্বয় দেবসেবা, গুরুসেবা, সাধুসেবা বা ভক্তসেবায় এবং তাঁর পদযুগল তীর্থভ্রমণে নিযুক্ত থাকলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতেন। তিনি বলতেন, ''ভগবান ইন্দ্রিয় দিয়েছেন নানাভাবে তাঁকে আস্বাদন করার জন্য, দেহসুখ ভোগ করবার জন্য নয়।'' কেউ তীর্থ থেকে ফিরলে তার কাছে তীর্থকথা শ্রবণ ও প্রসাদ গ্রহণের জন্য শ্রীম আগ্রহী হতেন। এমনকী হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হয়ে পুরীধাম থেকে আগত যাত্রীদের কাছে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করতেন।

স্কুলবাড়ির চারতলার ঘরটিতে তিনি একা থাকতেন। সেই ঘরে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখের আলোকচিত্র দেওয়ালে ঝোলানো থাকত। তিনি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম করতেন। তিনি সকল গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁদের সংবাদ নিতে কখনও তাঁর ভুল হত না। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দের শেষ অসুখের সময় শ্রীম প্রত্যহ আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা বসে থাকতেন। যেদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দের শরীরত্যাগের সংবাদ পেলেন, সেদিন দরজা বন্ধ করে বিছানায় পড়ে কাঁদতে লাগলেন। সমস্ত দিন অভুক্ত ছিলেন। সারাদিন কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেননি। সন্ধ্যার সময় যখন দরজা খুলে ভক্তদের কাছে এলেন তখনও তাঁর চোখে জল, মুখে কথা নেই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সম্পর্কে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কয়েকটি কথা বলেছিলেন। বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ঘরের সামনের বারান্দায় তিনি একদিন বিকেলে বসেছিলেন। এমন সময় মাস্টারমশাই কয়েকজন ভক্তসহ মন্দির প্রণাম সম্পূর্ণ করে স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে দর্শন করতে এলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁকে আলিঙ্গন করে তাঁর পাশের একটি চেয়ারে বসিয়ে বললেন, ''মাস্টারমশাই, আপনি কি অদ্ভুত 'কথামৃত'-ই লিখেছেন। তাতে কী যে মোহিনী শক্তি আছে তা মুখে বলে শেষ করা যায় না। যে পড়ে, সে-ই অবাক হয়ে যায়। কথামৃত পড়েই অধিকাংশ লোক সাধু হতে আসে। লোকে বলে, এরকমটি আর কোনও যুগেই হয়নি। অপর কেউ যদি এরকম কথামৃত লেখবার চেষ্টা করে তো সেটা নকল হবে। আসল আর হবে না।'' তাঁর কথা শুনে মাস্টারমশাই বললেন, ''আমি নই, আমি নই। তিনি, তিনি। তাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নিয়েছেন।''

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রীসহ বহু মানুষকে তীব্রভাবে আলোড়িত করেছে। তাঁদের স্মৃতিকথার সেইসব

অনুভূতি আজও পাঠকবর্গের মনকে ভিজিয়ে দেয়। 'থিস্টিক কোয়ার্টারলি রিভিউ' পত্রিকায় ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন, ''... যদি তাঁর সকল উক্তি লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহলে তা অদ্ভুত এবং অসামান্য প্রজ্ঞার এক গ্রন্থ হয়ে দাঁড়াবে। মনুষ্যজগৎ এবং বস্তুজগৎ সম্বন্ধে তাঁর সকল মন্তব্য উপস্থিত করলে মনে হবে, দিব্যবাণীর দিন, মৌলিক আদিম প্রজ্ঞার দিন আবার ফিরে এসেছে।" 'Men I have Seen' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, ''পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই সিদ্ধান্তেই আসি যে রামকৃষ্ণ কেবলমাত্র সাধক বা ভক্ত নহেন—তিনি সিদ্ধপুরুষ। প্রত্যক্ষ অধ্যাত্মদৃষ্টি দিয়া তিনি যে পরম সত্যকে দর্শন করিয়াছেন, যে-সত্য তাঁহার সাধনজীবনের উৎসরূপে বর্তমান—তাহা ঈশ্বরীয় মাতৃমূর্তি।" তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মজ্ঞের সরলতম ভাষায় পরমতত্ত্বের উন্মোচন শিবনাথ শাস্ত্রীকে অভিভূত করেছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের বাণী সেই কারণে আজও বহু মত ও পথের মানুষের কাছে আদরণীয়। তিনি শিব, কালী, রাম এবং কৃষ্ণের পূজা করেন। একইসঙ্গে বৈদান্তিক মতেও প্রতিষ্ঠিত। তিনি মূর্তিপূজক তবু অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চরম-অনুগত বার্তাদূত। তিনি ইসলাম ও খ্রিস্টমতে সাধন করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। ফলে এক ও অখণ্ড সত্যের প্রত্যয়ী ঘোষণা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে আমরা লাভ করেছি। শ্রীম অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে সেই বাণীপ্রবাহ গ্রহণ করে তাকে পরিবেশন করে গেছেন বিবদমান আগামী পৃথিবীর জন্য।

শ্রীম বলতেন, ''মিউজিক, পেইন্টিং এবং পোয়েট্রির মাধ্যমেও তাঁকে পাওয়া যায়। এই তিনটেই ফাইন আর্টস। স্কাল্পচারও আর একটি। ওতেও হয়।" শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনেছেন, নবীন ভাস্কর সারা দিনে একবার বেলা তিনটেয় হবিষ্যান্ন ভোজন করতেন। অত সংযত হয়ে, অত তপস্যা করে তবেই দক্ষিণেশ্বরের মা কালীকে বানিয়েছেন। তাইতো অত জীবন্ত। যে বানাবে তার মন ওই দৈবভাবে একেবারে মিলে যাবে, তবে হাত দিয়ে ওই ভাব পাথরে ফুটে উঠবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের নির্মাণও ঠিক এইভাবে। মহেন্দ্রনাথের সারাজীবনের সাধনা ও সংযমের ফলশ্রুতি সেই অমূল্য গ্রন্থ। তাই কি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ভবতারিণীর মতো জীবন্ত! ভাগবতের মতো অনন্ত! ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১)

২। সংকলন ও সম্পাদনা : স্বামী চেতনানন্দ, *শ্রীম সমীপে* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১৭)

৩। *শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর কথামৃত* (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম : হাওড়া, ১৯৯৬)

নিবোধত কার্যালয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

যতদিন কোভিড ১৯ সংক্রান্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলবে ততদিন সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী কার্যালয় বুধবার ও রবিবার বন্ধ থাকবে। খোলা থাকবে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো।

—কার্যাধ্যক্ষা